স্বদেশ

র‍্যাবের ভালো র‍্যাবের মন্দ

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব অভিযান শুরু করার পর থেকেই অসংখ্য পাঠকের প্রতিক্রিয়া আমরা পেয়েছি। একটি বিষয়ে পাঠকদের এতো চিঠি পাওয়াতে এ বিষয়টি নিয়ে পাঠকদের অভিমতকে কেন্দ্র করেই এবারের প্রচ্ছদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে পাঠকদের নির্বাচিত কিছু লেখা প্রকাশিত হলো।

- যাযাদি

মা দুর্গা আবির্ভূত হয়েছেন পৃথিবীতে র‍্যাব রূপে অসুর নিধনে ব্যস্ত মাকে রুষ্ট করো না

খুলনা শহরে বেড়াতে এসে এক বান্ধবীর বাসায় একটা যায়যায়দিন পেয়ে তা পড়তে লাগলাম। একদিনে তা শেষ হয়ে গেল। আগে কোনোদিন এই পত্রিকা পড়িনি। এই পত্রিকা (৩০ নভেম্বর সংখ্যা) পড়ে মনে হলো এর অনেক কথাই আমার মনের কথা। মনে মনে ভাবলাম, আমার মনের কথাটা তো বলা যেতে পারে। আমার বান্ধবী আমাকে উৎসাহিত করলো। তাই এ কথাগুলো লিখলাম। যদি পেপারে ছাপা হয় তবে খুশি হবো।

আমার বান্ধবী জানালো, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ কর্তৃক নাকি হরতাল ডাকা হয়েছে। কারণ র‍্যাব কর্তৃক ক্রসফায়ারে এক ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছেন। সে যে সন্ত্রাসী, আওয়ামী লীগ নেতারা অস্বীকার করেনি। তারা বলেছে, এই সন্ত্রাসীর নাকি মানবাধিকার রক্ষা করা হয়নি। এই কথাটি জানার পর আমার হৃদয়ের চাপা ব্যথাটি মানুষকে জানাতে চাই। বিশেষ করে ছাত্রলীগের ছাত্রদের।

আজ থেকে চার বছর আগে আমি ডুমুরিয়া থানার এক হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়তাম। আমার বাড়িও খুলনা জেলার এই সন্ত্রাস কবলিত থানার একটি নিভৃত গ্রামে। আমার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক। বাবার চাকরি আর আমাদের পাচ বিঘা জমিতে একটি ছোট মাছের ঘেরের ওপর সংসার ভালোই চলতো। হঠাৎ ওই সময়ে মৃণাল বাহিনী আমাদের মাছের ঘের দখল করে নিল। আমার নিরীহ হিন্দু বাবা তাদেরকে পা পর্যন্ত ধরেছে। কোনো ফল হয়নি।

এরপর বর্ষাকালের এক অন্ধকার রাত। মৃণাল বাহিনীর চার পাচজনের এক সন্ত্রাসী গ্রুপ অস্ত্রশস্ত্রসহ আমাদের বাড়ি হাজির। তারা আমার নীরিহ মা-বাবাকে হাত ধরে টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে বন্ধ করে রাখলো।

আমার কি ঘটলো আমি বলবো না। এ ঘটনা বলা যায় না।

ওরা চলে যাবার পর আমাকে জড়িয়ে ধরে মা আমার, ভেউ-ভেউ করে কাদতে লাগলেন। আমি নীরব হয়ে রইলাম।

সমস্ত দিন মা পাগলির মতো কাদলেন।

বাবা এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করলেন। সন্ধ্যায় এসে বাবা আমাদের এই পৃথিবীতে কেউ নেই বলে চেচিয়ে কেদে উঠলেন। আরো বললেন, ওরা শুধু ভোটের জন্য আমাদের কাছে আসে। এ দেশে আর না, চল ইনডিয়ায় গিয়ে না হয় আমরা ভিক্ষা করে খাবো। ভগবান নেই! ভগবান নেই!

এরা আমাদের স্বজাতি হয়ে আমাদের এতো ক্ষতি করতে পারে, বলে মাও কাদতে লাগলেন আর মাথা চাপড়াতে লাগলেন।

একটু পরে এক মেম্বার সাহেব আসলেন। তিনি বললেন, এ দেশ আর বাস করার মতো নেই। তোমরা ওপার চলে যাও। আমি ঠিকানা মতো সব টাকা পাঠিয়ে দেবো। আর অন্য কাউকে যদি জমি দিয়ে যাও তবে খবর আছে।

বাবা হ্যা-না কিছু বললেন না। কারণ লোকটি স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী নেতা, সন্ত্রাসীদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক।

সমস্ত দিন আমার কতো খারাপ লাগছিল বলতে পারবো না।

সন্ত্রাসীদের পৃথিবীতে আবার রাত এলো। আমার গা ছম ছম করতে লাগলো। মনে হতে লাগলো, এই বুঝি তারা আবার আসলো। আমি ভয়ে আজ মাকে জড়িয়ে ধরে শুলাম। ঘুম আসছিল না। এ সময় হঠাৎ অনুভব করলাম তারা আবার এসেছে।

চুপিসারে পেছনের দরজা খুলে দৌড় দিলাম ছোট কাকার বাড়ি। গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে চুপি চুপি এগোতেই কাকা আড়াল থেকে এসে আমার হাত ধরে কাদতে কাদতে বললেন, মা, ওদিক যাসনে।

ছোট কাকার ঘরে অজানা পুরুষের কণ্ঠস্বর আর ছোট কাকির চাপা চিৎকার শুনতে পেলাম। এক সময় চিৎকারটা মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে থেমে গেল।

আমার গা কাপতে লাগলো। পাথর হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। ঠিক এমনি সময় দুজন সন্ত্রাসী এসে কাকাকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। তারপর আর কিছু বলবো না।

ভোরবেলা আধার থাকতেই ওরা চলে গেল। যাবার সময় আমার গায়ের ওপর পাচ হাজার টাকা ছুড়ে মেরে বললো,

আমরা কাউকে ঠকাই না। তোদের ঘেরও ছেড়ে দিলাম। তবে এসব কথা কাউকে বলবি না। যদি কাউকে বলিস তাহলে এই যে পিস্তল দেখছিস, সব শুদ্ধ শেষ করে দেবো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালাবি না। পৃথিবীতে কেউ নেই যে, আমাদের হাত থেকে বাচে।

আমি বেড়ার কোণায় গুটিশুটি হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু শুনছিলাম। আমার নিয়তি নিয়ে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম পৃথিবীতে আমি কতো অসহায়! একবার ভাবলাম, এ জীবন রেখে লাভ কি? আত্মহত্যা করবো। তা হলো না। জীবনের ওপর আমার খুব মায়া। আর সব সময় কেন যেন আমার সামনে এই হতভাগা মা আর গোবেচারা বাবার মুখটা ভেসে ওঠে। আমার শুধু বেচে থাকতে ইচ্ছা হয়।

আমার আর আমার ছোট কাকির ওপর নির্যাতন রুটিনে পরিণত হলো। এলাকায় আমাকে নিয়ে কানাঘুষা শুরু হলো। আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হলো।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্গা পূজা শুরু হয়েছে আমাদের এলাকায়। রামায়ণ মহাভারতের সকল দেব-দেবীকে নিয়ে এবার প্রতিমা বানানো হয়েছে। ১৫৫টির মতো প্রতিমা। প্রতিমার খরচ ও উদ্যোক্তা ওই সন্ত্রাসী বাহিনী। তবু মনে হলো, যাবো প্রতিমা দর্শনে। ছোট কাকিকে রাজি করানো গেল না।

ভোরবেলা মার সাথে সাথে চুপিসারে পূজা দেখতে গেলাম। লোকজন নেই। মা আর আমি সমস্ত দেব-দেবীদের সামনে গিয়ে দাড়ালাম। করজোড়ে বললাম আমার মনের সকল দুঃখের কথা। মাও ভেউ ভেউ করে কাদলো প্রতিমাগুলোর সামনে দাড়িয়ে।

অবশেষে এক সময় আমরা মা দুর্গার প্রতিমার সামনে করজোড়ে আসন নিলাম। মনে মনে বললাম, হে মা দুর্গা! তুমি কি এই পৃথিবীকে দেখতে পাও না? তুমি কি আমাদের মতো মানুষকে মুক্তি দিতে পারো না? আমার চোখের পানি কি তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারে না?

আমার চোখ জলে ভরে গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। আমার এতো দিনের দেহ বাণিজ্যে অর্জিত টাকা আমার পাশে বসা মায়ের অলক্ষ্যে মা দুর্গার চরণে রেখে মাথানত করে আমরা বের হয়ে এলাম।

বিজয়া দশমীর দিন বিকেলবেলা। অবৈধ সন্তান গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে আমার নয় মাসের বিবাহিত, ফুটফুটে চেহারার ছোট কাকি মারা গেলেন। বাড়ি বাড়ি প্রাইভেট পড়িয়ে পয়সা রোজগারকারী ছোট কাকা আধা পাগল হয়ে পড়লেন। একদিন আমার হাত ধরে কাদতে কাদতে কাকা বললেন, মা, ওকে আমি আগলে রাখতে পারিনি। ও বড্ড হতভাগিনী। ওর মা বাবা কেউ ছিল না। তুই বল মা, আমার কি করার ছিল?

ওই দিন কাকার সাথে আমিও অনেক কাদলাম।

মা দুর্গা আমাদের কথা শুনেছেন। মা দুর্গা র‌্যাব রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। ইতিমধ্যে সেই অসুরগুলো বধ হয়েছে। আরো অনেক অসুর বধ হতে বাকি।

তোরা মা দুর্গাকে নীরবে কাজ করতে দে। না হলে যে মা রুষ্ট হবে। ছেড়ে যাবে আমাদের। তখন তোদের এসব দিদিদের কুমারীত্বের অধিকার, সতীত্বের অধিকার, কথা বলার অধিকার, চিৎকার করার অধিকার, বিচার চাওয়ার অধিকার, স্কুলে যাবার অধিকার, বেচে থাকার অধিকার, দেশে থাকার অধিকার ওরা কেড়ে নেবে। তোরা ভেবে দেখ ওই সব অমানবদের মানবাধিকার আর আমাদের মানবাধিকার, তোরা কোনটাকে চাস? বিএনপি যদি আমাদেরটা চায় তবে ওরা আমাদের মনে স্থান করে নেবে। তোরা কি অমানবদের মানবাধিকার সংরক্ষণ করে, ওদের আর্শীবাদ নিয়ে, ওদের ভোট পেয়ে ক্ষমতায় যেতে পারবি?

এক অসতী দিদি
ডুমুরিয়া, খুলনা।

লেখিকার চিঠি আমরা হুবহু প্রকাশ করলাম। আমরা তার সম্পূর্ণ নতুন একটি জীবন, পূর্ণ নিরাপত্তা এবং অশেষ মঙ্গল কামনা করি।

–যাযাদি

ভোট ঠিক জায়গায়ই দিয়েছি

চারদিকে বোমা আতংক, কলেজে পুলিশ ও দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে হয়রানি, এলাকায় মাস্তানদের চাদাবাজি ও অস্ত্রের ঝনঝনানি দলীয় শীর্ষ নেতাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাষণ ও আচরণ এবং বিভিন্ন সরকারি কাজকর্মে ঘুস দেয়া এসবে জীবনটা একেবারে বিষিয়ে উঠেছিল। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচন আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। আমি সে বছর আমার প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করি।

অবশ্য আমার আওয়ামী ভাইয়েরা আমাকে ভোটার লিস্টে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি। যদিও তখন আমি ডিগ্রির ছাত্র ছিলাম। তাদের অভিযোগ ছিল আমার বয়স কম। ভোট কেন্দ্রে দীর্ঘ লাইনে দাড়িয়ে যখন বুথে ঢুকি তখন ব্যালট পেপারে এতো জোরে সিল মেরে আমার জীবনের প্রথম ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করেছিলাম যে, 'ধুম' করে আওয়াজ হতে মনে পড়ে গেল আওয়ামী আমলের বোমা আতংকের কথা। যদি কাজ না হয় তাহলে আরো পাচ বছর এক অজানা আতংক। শেষমেষ এক অন্য রকম বিপ্লব ঘটে গেল। কিন্তু সন্ত্রাস তার অবস্থানে অনড়। এর মাঝে অপারেশন ক্লিন হার্ট কিছু আশার আলো জ্বালিয়েছিল কিন্তু তাও সাময়িক। ভোটের তিন বছর পরে আমি আমার ভোটের মূল্য বুঝতে পেরেছি। র‍্যাবই পারে সন্ত্রাস দমন করতে।

স্বাগত জানাই র‍্যাবকে। পত্রিকা পড়ে জানতে পেরেছি স্বাধীন দুর্নীতি কমিশনও গঠন করা হয়েছে। সন্ত্রাসের চেয়ে দুর্নীতি দমন করা আমাদের মতো দেশে অনেক কঠিন কাজ বলে আমি মনে করি। তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কমিশন র‍্যাবের মতো সফলভাবে অভিযান অব্যাহত ও জোরদার রাখবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে।

শুধু এ দুটি ব্যবস্থার কারণে আগামী নির্বাচনেও আমার ভোটটি ধানের শীষে পড়বে।

সুমন
stylesuman@hotmail.com

সন্ত্রাস দমন : বিরোধী দলের বিরোধিতা আসল কারণ

দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের বর্তমান সরকার সন্ত্রাস দমনে অত্যন্ত আন্তরিক। যে দুটি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে সে দুইটি হলো : *এক.* সন্ত্রাস দমন, *দুই.* দুর্নীতি উচ্ছেদ। জাতির কাছে দেয়া ওয়াদার বাস্তবায়ন স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী প্রথম সেনাবাহিনীকে দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অপরাধীর বিরুদ্ধে *অপারেশনে ক্লিন হার্ট* পলিচালনা নির্দেশ দেন। এতে আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি হয়।

মানুষের জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। সেনাবাহিনীর দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়। সেনাবাহিনী যে কয়েকদিন মাঠে ছিল সে কয়েকদিন সন্ত্রাসীরা আর মাঠে নামতে সাহস পায়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিলে পরিস্থিতি অনুকূল পেয়ে সন্ত্রাসীরা পুনরায় মাঠে নেমে আসে।

সন্ত্রাসীদের মূল আশ্রয় প্রশ্রয় দাতা কারা?

আমাদের দেশে যারা সন্ত্রাস, চাদাবাজি করে বিভিন্ন জোর-জুলুম চালায় তারা সংগঠিত এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতা হচ্ছে সব সরকারের আমলে কিছু সংখ্যক মন্ত্রী, এমপি, সরকার ও বিরোধী দলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনীতিবিদরা, অসৎ ওয়ার্ড কমিমনার এবং ইউপি চেয়ারম্যানরা। বড় বড় টেন্ডার ও টার্মিনালগুলোর চাদাবাজির ভাগ পাওয়ার জন্য, বাণিজ্যিক ও আবাসিক এলাকায় চাদাবাজি, দখল ও যাবতীয় অন্যায় আয়ের একটা বড় অংশ সন্ত্রাসীরা এক শ্রেণীর প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের দিয়ে থাকে। এই সন্ত্রাসীদের ক্ষমতার উৎস হচ্ছে অসৎ পলিটিশিয়ান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। এই পলিটিশিয়ানদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না, নিতে সক্ষম হয় না। পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর রয়েছে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

পুলিশ বাহিনী কেন সন্ত্রাস দমনে সফল হচ্ছে না

অসৎ পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অঢেল টাকা কামানোর জন্য সন্ত্রাস, চাদাবাজি, মাদক ব্যবসা এবং যাবতীয় অন্যয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। কারণ পুলিশের ওপর নজরদারির কেউ নেই। পুলিশের এক শ্রেণীর কর্মকর্তার প্রশয়ে ও আশ্রয়ে যাবতীয় কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়ে আসছে। সরকার পুলিশকে যে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেন তা দিয়ে তাদের সৎভাবে বেচে থাকা এবং আন্তরিকভাবে কাজ করা কঠিন। তারা যাতে অন্যায় ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য তাদের ভালো বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া আবশ্যক। তারপরও যারা অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, সরকার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, তদবির ও রাজনৈতিক চাপের কারণে তারা সন্ত্রাসী এবং অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, নিজ নিজ জেলার আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী-এমপিরা যদি পুলিশকে এই তদবির ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং চাপের বাইরে রাখতে পারেন তাহলে কার্যকরভাবেই সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব। এর প্রমাণ নারায়ণগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসী যেই হোক, তার বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে পদক্ষেপ নিন - কেউ বাধা দিলে আমাকে জানাবেন।
নিজ নিজ জেলার আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, এমপি ও কর্মকর্তারা যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে উপরোক্ত নির্দেশ দেন এবং যথাযথভাবে কার্যকর করেন তবেই সন্ত্রাস দমন সম্ভব।

সন্ত্রাস ও বিচার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য দায়ী আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা

আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা চারটি স্তরে বিভক্ত। যথা : ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, জজ কোর্ট, হাই কোর্ট ও অ্যাপেলাট বিভাগ। দেখা যায়, সন্ত্রাসীরা নিম্ন আদালতগুলোতে জামিন পাচ্ছে। না হয় উচ্চ আদালতে জামিন নিয়েই মামলার বাদী ও সাক্ষীদেরকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফলে মামলা পরিচালনা করা ও সাক্ষী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। সাক্ষীর অভাবে দাগি আসামি বেকসুর খালাস হয়ে যায়। প্রাণনাশের ভয়ে মামলার বাদীদের জীবনও হুমকি সম্মুখীন হয়ে দাড়ায় আর অপরাধী বহাল-তবিয়তে ঘুরে বেড়ায়। নিম্ন আদালতে সাজা হলেও উচ্চ আদালতে আপিল করে জামিন পায়। পুনরায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তাই বিচারক মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ যারা বাদী ও সাক্ষীর জানমাল বিপন্ন করে তোলে তাদের সহজে জামিন না দেয়ার জন্য। বাদী ও সাক্ষীর নিরাপত্তার জন্য দেয়া জামিন বাতিল করবেন।

বিচার ব্যবস্থা চারটি স্তর থেকে যদি দুটি স্তরে করা যায় এবং বিচারকদেরকে দুটি স্তরে একীভূত করা হয় তাহলে মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভব। যেমন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বিচারকরা জজ কোর্টের বিচারক বলে অভিহিত হবেন। এবং হাই কোর্টের বিচারকরা অ্যাপেলাট বিভাগের বিচারক বলে অভিহিত হবেন। তাহলে বিচার বিভাগ চারটি স্তর থেকে দুইটি স্তরে পরিণত হবে। বিচারে এতো দীর্ঘসূত্রিতা হবে না। মানুষের যথাযথ ন্যায় বিচার পাওয়া সম্ভব হবে। দুই- তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ পাওয়া বর্তমান সরকার সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে সহজেই তা করতে পারে। উক্ত পদক্ষেপের ফলে জাতি বর্তমান সরকারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

র‍্যাব, চিতা ও কোবরার কার্যকর ভূমিকা

সন্ত্রাস দমনে বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখছে র‍্যাব, চিতা ও কোবরা। বর্তমানে পুলিশ বাহিনীও বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস দমনে কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ২০০৩ সালের ১২ জুলাই-এ সংসদে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অ্যাক্ট সংশোধন করে *র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন* (র‍্যাব) বিল পাস করা হয়।

সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ, বিমান) বিডিআর, পুলিশ ও আনসার থেকে সৎ, দক্ষ, যোগ্য লোকদের বাছাই করে সন্ত্রাস বিরোধী উপযুক্ত ট্রেনিং দিয়ে র‍্যাব গঠন করা হয়। র‍্যাব দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যেসব সন্ত্রাসীরা ধরাছোয়ার বাইরে ছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখছে র‍্যাব। র‍্যাবের হাত থেকে দলমত নির্বিশেষে কোনো সন্ত্রাসীই রেহাই পাচ্ছে না। র‍্যাব যেখানেই অভিযান চালাচ্ছে সেখানেই আইন-শৃঙ্খলার অভাবনীয় উন্নতি ঘটছে। সন্ত্রাসীরা এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদের সর্বশেষ অধিবেশনে বলেছেন, এই পর্যন্ত গত তিন বছরে ৫০জন পুলিশ ও ৭,০০০ নিরীহ লোক সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়েছেন। যারা সন্ত্রাসীদের মানব অধিকারের কথা বলছেন তাদের কাছে প্রশ্ন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই পর্যন্ত যারা সন্ত্রাসীদের হাতে আহত ও নিহত হয়েছেন তাদের কি মানব অধিকার ছিল না? যে সমস্ত নারী সন্ত্রাসীদের হাতে ইজ্জত সম্ভ্রম হারিয়েছেন তাদের কি মানব অধিকার নেই? যাদের জায়গা-সম্পত্তি দখল হয়েছে, লুণ্ঠিত হয়েছে কোটি কোটি টাকার কষ্টার্জিত অর্থ তাদের কি সুবিচার পাওয়ার অধিকার নেই? তখন কোথায় ছিলেন সেই মানব অধিকারবাদীরা? সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত সেই ৫০জন পুলিশের কি মানব অধিকার ছিল না? আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ভয়ংকর এই অপরাধীরা গুলি চালাতে ও মানুষ খুন করতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা করে না। র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর রয়েছে নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার। তারা যদি পাল্টা গুলি বর্ষণ না করেন তাহলে সন্ত্রাসীরে হাতে তাদের লাশ হয়ে যেতে হবে।

সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী লীগের র‍্যাব বিরোধিতার কারণ

আমাদের দেশের রাজনৈতিক ট্র্যাডিশন অনুযায়ী কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য নানান রূপ মিথ্যা মামলা দিয়ে থাকেন। আওয়ামী লীগের মধ্যম সারির নেতৃত্বের অভিমত হচ্ছে, তারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত, সন্ত্রস্ত যে সরকার র‍্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে না আবার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নির্মমভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করেন। র‍্যাব গঠনের পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিরোধী দলকে আশ্বস্ত করতে বলেছিলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে বিরোধী দলকে দমনের জন্য এই বাহিনী ব্যবহার করা হবে না। সন্ত্রাসী ও অপরাধী ছাড়া আজ পর্যন্ত একজন রাজনৈতিক কর্মীও শুধু রাজনীতি করার কারণে র‍্যাবের হাতে নিগৃহীত হয়নি। সরকার এখনো পর্যন্ত র‍্যাব, চিতা ও কোবরা-কে বিরোধী দল দমন করার জন্য ব্যবহার করেনি।

আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরোধিতার আসল কারণ

র‍্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে সন্ত্রাস দমনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে যা গত আওয়ামী লীগ সরকার করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। র‍্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী

বাহিনী যদি সন্ত্রাস দমনে সফল হয় তাহলে জনগণের জোট সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা ফিরে আসবে। আওয়ামী লীগের আন্দোলন হালে পানি পাবে না। আন্দোলন করার ও জোট সরকারের প্রতি জনগণের অনাস্থা আনার কোনো সুযোগ থাকবে না। যদি সন্ত্রাস দমন অভিযান অব্যাহত থাকে তাহলে জনগণ পুরোপুরিভাবে আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন জোট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং চার দলীয় ঐক্যজোট সরকারকে পুনরায় বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবে। আর র‌্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকারী বাহিনীকে যদি কোনো কারণে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয় তাহলে এর যাবতীয় দায়ভার আওয়ামী লীগ জোট সরকারের ওপরই চাপিয়ে দেবে।

যদি মামলা ও অন্য কোনো কারণে র‌্যাব, চিতা, কোবরা-র কার্যকলাপ স্থগিত হয় তবে আইন-শৃঙ্খলার ভয়াবহ অবনতি ঘটবে। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বলতে কিছু থাকবে না। সর্বত্রই শুরু হবে ব্যাপক অরাজকতা, খুন, রাহাজানি, চাদাবাজিতে অতিষ্ঠ মানুষ জোট সরকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আওয়ামী লীগের আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ না করুক সমর্থন তো দেবে, এবং তাতে জোট সরকারের পতন না ঘটলেও পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবে। এভাবেই জোট সরকারের পতন ঘটবে। রাজনীতির দাবা খেলায় জোট সরকারকে পরাজিত করতে এটাই আওয়ামী লীগের চাল। আওয়ামী লীগের এই কৌশল সরকারকে বুঝতে হবে।

র‌্যাবের বিরুদ্ধে মামলার কারণ

খারাপ উদ্দেশ্যে র‌্যাবের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্যই র‌্যাবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত মামলায় বলা হয়েছে যে, র‌্যাব অবৈধ। অথচ সংসদে আইন পাস করার মাধ্যমে র‌্যাব গঠিত হয়েছে। সরকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উক্ত মামলার মোকাবেলা করতে হবে।

এই পর্যন্ত একজন নিরপরাধ মানুষও ক্রসফায়ারে প্রাণ হারায়নি। কোনো নিরপরাধ মানুষের যাতে প্রাণহানি না ঘটে, অন্যায়ভাবে কেউ যাতে হয়রানির শিকার না হয় তা র‌্যাব ও অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকারী বাহিনীকে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে তারা একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে এসেছে। কোনো অন্যায়ের জন্য আর কোথাও না হোক, মহান আল্লাহতাআলার দরবারে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে কারো বাচার উপায় নেই।

গাজী আমিন হোসেন রনি

দনিয়া, ঢাকা।

শাবাশ র‌্যাব এবং দুটি প্রশ্ন

সন্ত্রাসীদের জন্য র‌্যাব এক মহা আতংক। প্রায় প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, অমুক শীর্ষ সন্ত্রাসী, অমুক তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী, র‌্যাব ও সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে নিহত। তাই সন্ত্রাসীরা র‌্যাবের ভয়ে আশ্রয় নিচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে অর্থাৎ জেলখানায়।

সন্ত্রাসীদের এভাবেই নিধন করা উচিত একের পর এক। কারণ এটা উপমহাদেশের খুব সাধারণ ঘটনা যে, সন্ত্রাসীরা ধরা পড়লে সামান্য একটা ফোনকল বা প্রমাণের অভাবে তাদের আটকে রাখা যায় না জেলখানায়। এদের অপরাধের সাক্ষী এরাই। তাই ধন্যবাদ র‌্যাব, ধন্যবাদ র‌্যাবের নীতিকে। তবে র‌্যাবকে তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে এবং স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে *র‌্যাব* নামটি এখন যেমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে তারচেয়েও অনেকগুণ কালিমা নিয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে *লাল বাহিনী* বা *মুজিব বাহিনী*-র মতো।

এবার প্রশ্নে আসা যাক।

সন্ত্রাস দমনে র‌্যাবের এতো সাফল্য। তারপরও নিন্দুকের অভাব নেই। এরা সন্ত্রাসমুক্ত দেশও চায়, রাজনৈতিক চাপমুক্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীও চায়। কিন্তু তাদের ক্ষমতা দিতে চায় না, স্বাধীনভাবে কাজ

করতে দিতে চায় না। এরা যতো না খারাপ কাজের সমালোচনা করে তারচেয়ে ঢের বেশি ভালো কাজের সমালোচনা করে। কেন? নিশ্চয়ই তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তবে দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, আমার মতো যারা অরাজনৈতিক মানুষ, সন্ত্রাস যাদের স্বাভাবিক গতিকে বাধাগ্রস্ত করে তাদের সমর্থন আছে র‌্যাবের ওপর। র‌্যাব কাজ করুক তার সাধারণ গতিতে। এবং হয়ে উঠুক সকল অপরাধীদের আতংক।

র‌্যাবের উপস্থিতিতে সামাজিক অপরাধও অনেকাংশে কমে গেছে। কারণ এখন পত্রিকার পাতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক খুনের বদলে ক্রসফায়ারে শীর্ষ এবং সাধারণ সন্ত্রাসীদের খবর দেখা যায়। কিন্তু এই সন্ত্রাসীরা কারা? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী। এটা আমাদের দেশের কম বেশি সব লোকই জানে, বর্তমানে যে কোনও রাজনৈতিক দল সন্ত্রাসীদের ওপর নির্ভরশীল তথা সকল রাজনৈতিক দলেই সন্ত্রাসী বিদ্যমান। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, র‌্যাবের হাতে এ যাবৎ যে সকল সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কেউ-ই চার দলের শরিক দল জামায়াত-এ-ইসলামী দলের রগকাটা সন্ত্রাসী নয়। তবে জামায়াত-এ-ইসলামীর নেতা হয়তো দাবি করবেন, তাদের দলে কোনো সন্ত্রাসী নেই বলেই ধরা পড়ছে না।

কথাটি কি বিশ্বাসযোগ্য? আমার প্রশ্ন হলো, র‌্যাব কি তাদের ধরছে না? নাকি তারা এতোই ধূর্ত যে, ধরতে পারছে না?

তাদের না ধরলে বা ধরতে না পারলে তাদেরকে পক্ষান্তরে উৎসাহই দেয়া হবে। এখন যেমন দেশের শাসনভার আওয়ামী লীগ বা বিএনপির হাতে বন্দী। এমনটি হতে থাকলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে, নিকট ভবিষ্যতেও হতে পারে হয়তো একমাত্র জামায়াতই এ দেশের শাসনভার দখল করে রাখবে। বিষয়টা ভাবার মতো।

এফ. রাব্বী

তেজগাও, ঢাকা।

হ্যালো... বিরোধী দলীয় নেত্রী

গত ৬ ডিসেম্বর ভোরে দেশে ফিরেছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। আমেরিকায় দীর্ঘ সফর শেষে তিনি দেশে ফিরলেন। এয়ারপোর্টে পৌছেই সাংবাদিকদের কাছে তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। রসহীন, উগ্র ভাষায় তিনি সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, *সরকার র‌্যাবকে মানুষ মারার লাইসেন্স দিয়েছে। র‌্যাবের কার্যক্রমে মানব অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এই কারণে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। সরকারই সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে এখন হত্যা করছে। কেউ কেউ র‌্যাবের কাজকে সন্ত্রাস নির্মূল হিসেবে বাহবা দিচ্ছে। কিন্তু এর দ্বারা সন্ত্রাস নির্মূল হবে না।*

তার কথাগুলোর উত্তরে বলতে চাই, সরকার র‌্যাবকে মানুষ মারার লাইসেন্স দিয়ে হলেও অন্তত সন্ত্রাস দমনে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। আপনিও তো পাচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। সে সময়ও সন্ত্রাস কোনো অংশ কম ছিল না। সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি? আপনার দলেই তো ছিল জয়নাল হাজারী, শামীম ওসমান, তাহের, হাজি সেলিম, হাজি মকবুল আর বোমামানিকের মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা। তাদেরকে সন্ত্রাসের লাইসেন্স কে দিয়েছিল? তাদের বিরুদ্ধে একশন না নিয়ে আপনি নিজেই তাদের পক্ষে সাফাই গাইছিলেন। বর্তমান সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। ক্রসফায়ারে সরকার দলীয় সন্ত্রাসীরাই বেশি নিহত হয়েছে। *দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভালো* এই নীতিতে বিশ্বাসী বর্তমান সরকার। সেই সৎ সাহস আপনি বা আপনার দল দেখাতে পারেনি। ফলে আপনাদের প্রতি জনগণ বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছে।

আপনি বলেছেন, র‌্যাবের কার্যক্রমকে কিছু মানুষ বাহবা দিচ্ছে।

সুদূর আমেরিকায় বসে আপনি হয়তো আচ করতে পারেননি। র‌্যাবের কার্যক্রমকে দেশের সিংহ ভাগ মানুষই সমর্থন করছে। বর্তমানে মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে। র‌্যাবের অভিযান অব্যাহত থাকুক এটাই দলমত নির্বিশেষে সবার দাবি।

আপনাদের মতো যারা সরকারের ভালো কাজ দেখলে জ্বালা ওঠে, তারাই কেবল র‌্যাবের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছে। সন্ত্রাসীরা ক্রসফায়ারে মরুক বা সরাসরি ফায়ারে মরুক এতে জনগণের কোনো মাথা ব্যথা নেই। সাধারণ মানুষ চায়, যে কোনো মূল্য সন্ত্রাস নির্মূল হোক। র‌্যাবের হাতে যেন কোনো নিরীহ মানুষ খুন বা লাঞ্ছিত না হয় এটাই দেখার বিষয়। এই মুহূর্তে সন্ত্রাসীদের জন্য যারা মায়াকান্না করবে তারাই সন্ত্রাসের জন্মদাতা।

সন্ত্রাসীদের হাতে যখন শ শ লোক নিহত হয় তখন আপনাদের মানব অধিকারের বুলি কোথায় থাকে? পেশাদার মানব অধিকার সংগঠনগুলোকে সেদিন পাওয়া যায় না কেন?

সন্ত্রাসী কেবল সরকারি দলই সৃষ্টি করেনি। আপনারা এক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে। গত নির্বাচনে আপনাদের ভরাডুবির এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। কুখ্যাত সন্ত্রাসী জয়নাল হাজারীর জন্য ভোট চেয়ে প্রমাণ করেছেন, আপনি সন্ত্রাসীদের কতো বড় আশ্রয়দাতা। কে সন্ত্রাসী সৃষ্টি করে সেটা আপনাদের বলে দিতে হবে না। এটা জনগণই বিচার করবে।

আপনি বলেছেন, র‌্যাবের কার্যক্রম দ্বারা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আপনি যখন দেশে দেশে ঘুরে বাংলাদেশকে একটি সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে সহানুভূতি কুড়াতে চান তখন এই ভাবমূর্তির চিন্তা কোথায় থাকে? নিজ দেশের প্রতি অপপ্রচারই প্রমাণ করে আপনার দেশপ্রেম কতোটুকু আছে!

মুহাম্মদ জহির উদ্দিন বাবর

গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

ওরা মানুষ নয়

বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রায় দেড় মাসব্যাপী আমেরিকা ও বৃটেন সফর শেষে দেশে ফিরে এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের বলেছেন, *জোট সরকার বিশেষ বাহিনী (র‌্যাব, চিতা) দিয়ে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা করছে।*

তিনি সরকারের বিরুদ্ধে মানব অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছেন।

আসলে শেখ হাসিনা ভুল ভাবছেন। র‌্যাব বা চিতা কোনো মানুষ হত্যা করছে না। তাদের হাতে কিছু সন্ত্রাসী মারা যাচ্ছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে! দেশের জনগণ এখন শান্তিতে আছে। জনগণের চাওয়া-পাওয়া প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের মূল্যায়ন করা বিধেয় নয় কি?

সজল চক্রবর্তী

রায়পাড়া, পালংগঞ্জ

দোহার, ঢাকা।

কান নাকি মগজ?

একাত্তরে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে একটি বেফাস মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। মুক্তিযুদ্ধের গত ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার র‌্যাবকে দিয়ে একাত্তরের গণহত্যা ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মতো নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে।

প্রতি বছরের মার্চ কিংবা ডিসেম্বরে আওয়ামী নেতাদের আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ ঘটিয়ে ফেলার রুটিন মাফিক কোনো বস্তাপচা হুমকি নয় এটি। সদ্য ইওরোপ-আমেরিকা থেকে দেড় মাস ঘুরে আসা শেখ হাসিনার ফ্রেশ মাথার ফ্রেশ আইডিয়া এটি।

জননেত্রীর এই তত্ত্ব শুনে কেউ কেউ হয়তো দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যেতে পারেন, র‌্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত পিচ্চি হান্নান কিংবা নারায়ণগঞ্জের ত্রাস ডেভিডরা কি তাহলে মুনীর চৌধুরী অথবা শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো

বুদ্ধিজীবী ছিলেন? ফটিকছড়ির ছাত্রদল ক্যাডার সজল নাথ কি ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দেবের মতো শিক্ষাবিদ-দার্শনিক?

অথচ সবাই জানেন, পিচ্চি হান্নান কবরে যাওয়ার আগে *কবর*-এর মতো একটি নাটক লিখে যায়নি। কিংবা নিজে যতোই নষ্ট ছেলে হোক না কেন, ডেভিড তার জীবদ্দশায় *নষ্ট ছেলের* মতো একটি ছোট নাটিকাও লিখে যেতে পারেনি। ছাত্রদল ক্যাডার সজল নাথ জোর করে একটি সুন্দরী মেয়েকে বৌ বানালেও র‍্যাব যখন তাকে বেরসিকের মতো বাসরঘর থেকে গ্রেফতার করেছিল তখন *সারেং বউ*-এর মতো একটি উপন্যাস লিখে ফেলার আইডিয়া সজলের মাথায় একদমই ছিল না। র‍্যাবের হাতে এদের মৃত্যুর সঙ্গে *কবর* ও *নষ্ট ছেলে* নাটকের স্রষ্টা মুনীর চৌধুরী কিংবা *সারেং বউ*-এর মতো উপন্যাসের রচয়িতা শহীদুল্লাহ কায়সারের আত্মত্যাগের তুলনা করার বুদ্ধি এতোগুলো অনারারি পিএইচডি ডিগ্রি পাওয়া জননেত্রীর মাথা থেকে কিভাবে বের হলো? মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সারদের স্মৃতি কি জননেত্রী ভুলতে বসেছেন?

জননেত্রীর যদি স্মৃতি বিভ্রম না ঘটে তাহলে ষাটের দশকে তাদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ চট্টগ্রামের একটি পরিবারের এক বেহায়া ব্যক্তির কথা তার নিশ্চয়ই মনে আছে। যিনি বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা সেই ব্যক্তির পালিত ক্যাডার জানে আলমকে টানা দশ ঘণ্টা বন্দুক যুদ্ধের পর র‍্যাব যখন তার সাত সহযোগীসহ তাকে হত্যা করেছিল, রাউজানের মানুষ তখন উল্লাসে এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছিল। ১৯৭১ সালে শহীদুল্লাহ কায়সার যখন পাকিস্তান আর্মির নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছিলেন তখন ফেনীতে মিষ্টি বিতরণ হয়েছিল কি জননেত্রী?

র‍্যাব একাত্তরের মতো একই কায়দায় গণহত্যা চালাচ্ছে বলে জননেত্রী যখন আবিষ্কার করেন তখন অনেকের স্মৃতিতেই ভেসে ওঠে পাকিস্তানি আর্মির জ্বালানো আগুনে পুড়ে যাওয়া শ শ গ্রামের দৃশ্য যেখানে নির্বিচারে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অসহায় নির্যাতিত মানুষদের সেই সময়ের জীবন নিয়ে আজ ৩৩ বছর পরও *জয়যাত্রা, শ্যামল ছায়া*-র মতো অসাধারণ মুভি তৈরি হয়।

এখন জননেত্রী বলুন, র‍্যাব কি বাংলাদেশের একটি গ্রামও পুড়িয়েছে? লাখ লাখ তো দূরে থাক, এ পর্যন্ত ১০০জনও কি র‍্যাবের গুলিতে নিহত হয়েছে? তাহলে কোথায় আপনার দেখা গণহত্যা? আজ থেকে ৩৩ বছর পর ২০৩৭ সালে কোনো তৌকির বা হুমায়ূন আহমেদ কি আপনার এই কল্পিত গণহত্যা নিয়ে মুভি বানাবেন?

একাত্তরের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে এ দেশের এক কোটি মানুষ ইনডিয়ার কলকাতা, আগরতলাসহ সীমান্তবর্তী এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। আর আজকে র‍্যাবের অভিযানে কলকাতায় গা ঢাকা দিয়েছে কালা জাহাঙ্গীরের মতো টপ টেররররা যারা জননেত্রীর সোনালি শাসন আমলে ঢাকা শহরে দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেড়াতো। (এখনো যিনি অন্তত একবার জননেত্রীর সঙ্গে আইএসডি ফোনে কথা বলেছেন বলে জননেত্রী নিজেই উল্লেখ করেছিলেন!) চট্টগ্রাম সিটি কর্পরেশনের নির্বাচনে জননেত্রীর মন ও নয়ন জয় করে মনোনয়ন পাওয়া কমিশনার মামুনও তার সন্ত্রাসের রাজত্বটি ছেড়ে র‍্যাবের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কলকাতায়। এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীর দেশত্যাগের সঙ্গে কি তুলনা চলে এক কোটি উদ্বাস্তুর?

তাহলে কিভাবে বর্বর পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে তুলনা করা হলো এ দেশের সাহসী, দক্ষ ও তরুণ পুলিশ এবং সেনা অফিসারদের নিয়ে গড়া র‍্যাবের? ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলায় জননেত্রীর কান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নাকি মগজ?

শেখ রাসেল

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি।

আরো সফল হোক র‍্যাবের কর্মসূচি

১৪ কোটি মানুষ অধ্যুষিত বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভোগ্যের কোনো শেষ নেই। কখনো বন্যা, কখনো ঘূর্ণিঝড়, কখনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, আবার কখনো চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই-এর ঘটনা। অহরহ ঘটনা ঘটেই চলছে প্রতিদিন। খবরের কাগজে টিভি সংবাদে প্রতিনিয়তই খুন, ধর্ষণ চাদাবাজি ইত্যাদি। খুন খারাবি করেই যেন

আমরা শান্তি পাই। গণতন্ত্র আছে বলেই কি, আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো সব কাজ করে যাবো? সবুজ বাংলাদেশে যেখানে আমাদের ঘুম ভাঙতো পাখির কলকাকলিতে, মায়ের মধুর হাতের স্পর্শে, আজ সেখানে ঘুম ভাঙে বোমাবাজির আওয়াজ শুনে, গুলির শব্দে, নয়তো পাড়া-পড়শির চিৎকারে।

গত বছরে অনেক সরকারই বদল হয়েছে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের জন্য কার্যকর কোনো আইনই তৈরি হয়নি। যে কারণে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের প্রধান সমস্যা। সমস্যা এতো প্রকট হয়ে উঠেছে যে, বিশ্বের দরবারে আমরা পর পর দুইবার জয়ী হয়েছি সন্ত্রাস ও দুর্নীতির দিক দিয়ে। এরপরেও সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের জন্যে আমাদের সরকারের কোনো পদক্ষেপ নেই কেন?

গত কয়েকদিনে লক্ষ্য করেছি র‌্যাবের বাস্তবমুখী কর্মসূচি। সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে তারা। মনে হয় কিছুটা স্বস্তি ফেলতে পারছে মানুষ। কিন্তু হঠাৎ করে মনের ভাবনা থমকে দাড়ায়। কতোদিন চলবে তাদের কার্যক্রম? এটা কি ক্ষণিকের জন্য সান্ত্বনা না বহির্বিশ্বের মানুষকে দেখানো যে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে বর্তমান সরকার নানানমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তবে যাই হোক না কেন, র‌্যাবের কার্যক্রমকে আরো দ্রুত বৃদ্ধি করতে হবে। এবং তাদের কার্যক্রমকে স্থায়ী করার জন্য, সংসদে নতুন আইন তৈরি করতে হবে এটাই আমাদের চাওয়া। যেদিন বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি শেষ হয়ে যাবে সেদিনই এ দেশের শিক্ষিত যুবকেরা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নেবে।

সর্বশেষে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন যে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের জন্য সংসদে নতুন আইন তৈরি করে র‌্যাবের কর্মসূচিকে আরো অগ্রাধিকার দেয়া হোক। যাতে করে বহির্বিশ্বের মানুষের কাছ থেকে কলংকজনক সার্টিফিকেট মুছে ফেলতে পারি চিরদিনের জন্য।

এম.এ বাবলু
সউদি আরব।

টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

একুশে আমাদের একটি অতি পরিচিত শব্দ। বার বার প্রতি বছর এই শব্দটি ফিরে আসে বাংলার বুকে নতুন রূপে। এবার এই একুশে নতুন আমেজে, নতুনভাবে যোগ হয়েছে বাংলার মানুষের ঘটনা বহুল সংগ্রামী জীবনে। আগামী বছর থেকে ২১ আগস্ট নতুনভাবে পালিত হবে মিছিল মিটিং আর হরতালের মাধ্যমে।

নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিতে আওয়ামী লীগের জুড়ি নেই। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন কাহিনী অন্য কেউ বানাতে পারবে বলেও মনে হয় না। কারণ তারা মিথ্যা কথাকে যতো সুন্দর করে বলতে পারে, অন্যরা সত্য কথাকেও ততো সুন্দর করে বলতে পারে না। তাই তাদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

অস্ত্রের নতুন চালান?

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ চেয়েছিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই সরকারকে ৯০ দিনও টিকতে দেয়া হবে না। তাই তারা বলেছিল, *শপথও নেবো না সংসদেও যাবো না*। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হলো তখন *নাই মামার চেয়ে কানা মামাও* নাকি ভালো। ফলে সরকারি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা খাওয়ার জন্য এবং সংসদের পরিবেশ ঘোলা করার জন্য নাকে খত দিয়ে সংসদে ঢুকলো। পরবর্তীকালে তাদর টার্গেট ছিল আড়াই বছরের বেশি এই সরকারকে কোনো মতেই টিকতে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ ১৯ এপৃল ২০০৪। তারা ৩০ এপৃলকে তাদের চূড়ান্ত টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়ে বিষ কামড় দিতে চেয়েছিল জোট সরকারকে। ৩ এপৃল চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক ভর্তি বিপুল পরিমাণ ভয়ানক অবৈধ মারণাস্ত্রের চালান ধরা পড়াতে তাদের সকল ষড়যন্ত্র আবারও ব্যর্থ হলো। আবদুল জলিল তার ট্রাম্প কার্ডটি ছাড়তে পাড়লেন না। গত ২৯ নভেম্বর ২০০৪-এ আওয়ামী জোট টেকনাফে বলেছে, প্রয়োজনে ১৯৭১-এর মতো মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সরকার পতনের

আন্দোলন সফল করা হবে। তাহলে প্রশ্ন আসে, এতো অস্ত্র তারা কোথা থেকে পাবে? নাকি নতুন চালান ইতিমধ্যে এসে পড়েছে?

সেই একই ভূত

গত তিন বছরে আবদুল জলিল দলের বদনাম ছাড়া লাভ কিছুই করতে পারেননি। বিএনপির গডফাদার লিস্টে ভুল। ৩০ এপ্রিল সরকার পতনের সময়সূচি বেধে দিয়ে দেশবাসীর কাছে হাসির পাত্র হয়েছে আওয়ামী লীগ। এবং ইন্টারপোলের বিরোধিতা করে জাতিসংঘ বা কমনওয়েলথের তদন্ত পুলিশ চেয়েছিলেন আবদুল জলিল। কিন্তু তার জানা ছিল না যে, জাতিসংঘ বা কমনওয়েলথের এ ধরনের কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনো পুলিশ বাহিনী নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি সব কিছু গোলমাল পাকিয়ে ফেলছেন? এছাড়া জনধিকৃত বামদের নিয়ে নতুন জোট করাতে আওয়ামী লীগের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছে লাভের চেয়ে অনেক বেশি। মেনন, ইনু, কামাল দিয়ে যদি কিছু হতো তাহলে বামদের দলে দিন দিন জনবল না কমে বাড়তো! এটা বোঝার মতো ক্ষমতা আবদুল জলিলের আছে বলে মনে হয় না। বিএনপি জোট বেধেছে সংসদে যাদের অল্প হলেও সিট আছে, জনবল আছে। আবদুল জলিল জোট বেধেছেন তাদের সঙ্গে যাদের মিছিলের কর্মী পর্যন্ত ভাড়া করে আনতে হয়। তাদের সঙ্গে ১১ দলের সংসদে সিটের সংখ্যা না-ইবা বললাম! পাঠকরাই তা ভালো জানেন। বামরাই ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগকে ডুবিয়েছিল। এবার আবার সেই একই ভূত তাদের কাধে চেপেছে!

লাশের রাজনীতি

সকল ষড়যন্ত্র যখন ব্যর্থ হওয়ার পর্যায়ে তখন আওয়ামী লীগ দিশেহারা হয়ে যায় এবং অনেকের ধারণা, বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীকে হত্যার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জোট সরকারকে একটি ব্যর্থ সরকার বানিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন তাও ব্যর্থ হলো তখন ২১ আগস্টকে টার্গেট করে নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনলো। কয়েকজন কর্মীর জীবনের বিনিময়ে যদি সরকারের পতন সম্ভব হয় তবে মন্দ কি তাতে? যাকে বলে *লাশের রাজনীতি*। কিন্তু টার্গেটে কিছুটা ভুল হওয়াতে একজন নেত্রীরও মৃত্যু হয়। এর প্রমাণ হলো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের চেয়ে এক দফা সরকারের পদত্যাগে দাবি যা পৃথিবীর কোথাও কোনো রাজনৈতিক দল এভাবে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেনি। এটা প্রমাণ করে যে, ক্ষমতা দখলের পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এটা অন্য কিছু ছিল না। এবং পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ। কিন্তু সরকার সেই দাবি মেনে নেয়াতে তাদের আশা আর পূরণ হলো না। পরে তাদের মানববন্ধন ও সরকার বিরোধী আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারেনি প্রকৃতির বৈরী আচরণ বন্যা ও অতি বৃষ্টির কারণে এবং রমজান মাসের জন্য।

২৫ বছর রোজার পর পাচ বছর ইফতারি

যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তারা রাজনৈতিক পরিবেশ ঘোলা করার জন্য সর্বপ্রকার কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। জনগণের ভোট নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না বলেই তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী নয়। আওয়ামী লীগ যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতো হবে তারা গণতন্ত্রে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কখনো জোট গঠন করতে পারতো না। আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রেও কথা বললেও অন্তরে যে তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় এ জোটই তার বহিঃপ্রকাশ। গণতন্ত্রের সুযোগ তারা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেও গণতন্ত্র তাদের আদর্শের সঙ্গে কখনো খাপ খায়নি। ফলে দিন দিন তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং সংসদে তাদের আসন সংখ্যা ক্রমেই কমছে।

আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংশোধনীর আড়ালে ক্ষমতার পরিবর্তন চায়! যদি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশোধন দরকারই ছিল তবে ১৯৯৬ থেকে ২০০১-এর ভেতরে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল তখন কেন তারা তা পরিবর্তন করলো না? তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি যখন তাদের জন্য খুব ভালো ছিল,

এখন কি কারণে তা পরিবর্তনের দরকার হলো? আওয়ামী লীগ ভালো করেই জানে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি যতোদিন টিকে থাকবে ততোদিন ক্ষমতায় যাওয়া আওয়ামী লীগের জন্য এতো সহজ হবে না যতোটা না হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। কারণ গত ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের পাচ বছরে তারা যতো দুর্নীতি করেছে তার কাফফারা হিসেবে আবারও হয়তো তাদের ২৫ বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। অনেকটা সহজে বলা যায়, ২৫ বছর রোজা রেখে পাচ বছর ইফতারি করার মতো। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে, রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ শূন্য করে, শেয়ার বাজার ধ্বংস করে, সন্ত্রাস করে দেশ চালিয়েছিল তারা যা সহজে ভোলার নয়।

টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া

মানুষ কি খুব সহজে অতীত ভুলে যায়? না। যেমন আমরা ১৯৭১ ভুলতে পারিনি তেমনি ১৯৯৬ থেকে ২০০১ আওয়ামী দুঃশাসনও মানুষ খুব সহজে ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না। জয়নাল হাজারী, হাজি সেলিম, ডা. ইকবাল, তাহের, শামীম ওসমানদের কথা কি মানুষের হৃদয়ে থেকে খুব সহজে মোছা যাবে? দলীয়ভাবে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, দলীয়ভাবেই আওয়ামী লীগের সবাই তাদের সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিল সুতরাং এতো সহজে মানুষ আবার ভোটের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায় বসাবে এটা আওয়ামী লীগ। তাই বিশ্বাস করে না। তাদের এই বাকা পথ! *টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, তখন আওয়ামী সন্ত্রাস ছিল দেশ জুড়িয়া*। আবারও তারা সারা দেশে সন্ত্রাস করে ক্ষমতায় যেতে চায়। জন্যই তো তাদের এতো দুঃখ যখন র‍্যাবের হাতে কুখ্যাত সন্ত্রাসীদের মৃত্যু হয়। গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪০%য়ের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিল। এতে তারা ভীষণ খুশি। বাস্তবে তাদের খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কালো টাকা এবং সদ্য ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়াতে তার প্রভাব বিরাট ভূমিকা রেখেছিল গত নির্বাচনে যা একজন শিশুও বুঝতে পারে। গরম তেল ঠাণ্ডা হতে কিছুটা সময় লাগে বৈকি।

গ্রেনেড হামলা থেকে শুরু করে শেখ হাসিনার গাড়িতে গুলি ছোড়া সবই রহস্য ঘেরা গভীর ষড়যন্ত্রের নোংরা খেলা ছাড়া কিছুই না। শেখ হাসিনার গাড়িতে যে গুলি ছুড়েছিল সে নিঃসন্দেহে আসিফের চেয়েও দক্ষ শুটার এতে সন্দেহ নেই। কারণ এতো সূক্ষ্মভাবে গুলি ছোড়া সাধারণ কোনো সন্ত্রাসী দ্বারা সম্ভব নয়। সে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে স্বর্ণ জয় করতে পারবে। গ্রেনেড হামলার পর শেখ হাসিনাকে পাহারা দিয়ে যে পুলিশের গাড়িটি নিয়ে গিয়েছিল তাদের ভাষ্য মতে, গাড়িতে কোনো গুলির চিহ্ন ছিল না এবং কেউ তাকে গুলিও করেনি। এছাড়া গাড়ির চাকা নষ্ট হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে ধানমন্ডি পর্যন্ত ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, অথচ চাকার (টায়ারের) যে পরিমাণ ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল তার কিছুই নষ্ট হয়নি। এছাড়া কেউ গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে গাড়ির বডিতে দুই একটি লাগার কথা।

এটাই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গাড়িতে সন্ত্রাসী আক্রমণের ফল দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, একটি গুলিও শেখ হাসিনার গাড়ির বডিতে লাগেনি। হয়তো সন্ত্রাসীরা জানতো গাড়ির গ্লাস পরিবর্তন করতে কোনো সমস্যা হয় না বা গাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট হয় না। কিন্তু বডিতে গুলি লাগলে গাড়ির বড় ক্ষতি হয়। তাই তাদের এই সাবধানতা। সরকারের পক্ষ থেকে বার বার গাড়ি ইনভেস্টিগেশনের জন্য চাওয়া হলেও তা সরকারকে দেয়া হয়নি বিভিন্ন অজুহাতে। তাহলে সব কিছুই কি একটি সাজানো নাটক ছিল? গাড়ি যদি ভালোভাবে এক্সপার্ট দিয়ে ইনভেস্টিগেশন করা যেতো তবে এই রহস্যের জট খুলতে সরকারকে বেশি দূর যেতে হতো না। যদি ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয় যে, এসবই এক সাজানো নাটক ছিল তবে বামদের অবস্থা তখন কি হবে? তখন কি বলবেন? আওয়ামী লীগের স্বভাব-চরিত্র সবার জানা। সকালে বলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, বিকেলে বলে সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমে তাদের হারানো হয়েছে। সুতরাং তারা তাদের কর্মীদের ঠিকই বোঝাতে পারবেন। কারণ নেতারা যদি দিনকে রাত আর রাতকে দিন বলে তবুও তাদের কর্মীরা তা বিশ্বাস করে।

এ রহমান
সউদি আরব
azad71@hotmail.com

সন্ত্রাস দমন সরকার ও জনগণ এক মোহনায়

সন্ত্রাস দমনে সরকার র‍্যাব গঠন করে এবং জনগণ র‍্যাবের কার্যক্রম দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়ে সরকার ও জনগণ এক মোহনায় এসে মিশে গেছে। সরকারের কাছে জনগণের দাবি সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের মূল উৎপাটন। এবং সরকারের করণীয় হলো জনগণের দাবি মোতাবেক সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের চিরতরে নির্মূল করে জনগণের ভেতর স্বস্তি এবং নিরাপত্তা এনে দেয়া। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের হাজারো ব্যর্থতা, হাজারো গাফিলতি থাকলেও সরকার যে জনগণকে ভালোবাসে ও জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল জনগণও যে সরকারকে ভালোবেসে ফেলেছে এবং সরকারের কাজের প্রতি আস্থাশীল তা আজ প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে সরকারের র‍্যাব গঠন করার মধ্য দিয়ে এবং দল-মত-ধর্ম-বর্ণ বাছবিচার না করে তাদের সন্ত্রাসীদের নির্মূল অভিযানে হস্তক্ষেপ না করে। তাই জনগণ এ রকম সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক র‍্যাব বাহিনীকে সুস্বাগতম জানিয়েছে।

তবে অতীতে অভিজ্ঞতার আলোকে জনগণের ভাবনা, দুষ্ট লোকদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে সরকার র‍্যাবের কার্যক্রমকে মাঝ পথে বন্ধ করে দেবে না তো? এই যখন জনগণের আশংকা তখন দেখা যাচ্ছে স্রেফ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের কেউ কেউ র‍্যাবের সমালোচনা করে র‍্যাবের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদেরকে দাড় করিয়ে ফেলেছেন। অথচ র‍্যাবের একমাত্র প্রতিপক্ষ তো সমাজের দুষ্ট ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। আর তো কেউ না। তাহলে জনগণ কর্তৃক র‍্যাবের সকল কার্যক্রম সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কেন র‍্যাবের সমালোচনা করে নিজেদেরকে জনগণের প্রতিপক্ষ বানাতে চাইছেন, চাইছেন সন্ত্রাসীদের সঙ্গে এক কাতারে দাড়াতে?

অবমাননাকর কিন্তু জীবন হানিকর নয়

আমার মন্তব্যটি খুবই অবমাননাকর। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই জীবন হানিকর নয়। অথচ সন্ত্রাসীদের দাপটে সন্ত্রাসের শিকার হয়ে যখন নিরীহ জনগণ প্রাণ, সম্পদ, ইজ্জত হারায়, দুর্বিসহ জীবনের শিকারে পরিণত হয় তখন ওই সব স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা জনগণের মানবতা বিপন্ন হতে দেখেন না। আর যখন র‍্যাব বাহিনী জনগণকে তাদের ওই ধরনের বা অবমাননাকর ও অকাল জীবনহানির হাত থেকে বাচার জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মরণাপন্ন লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই লড়াইয়ে র‍্যাবের রণকৌশলের কাছে হার মেনে যুদ্ধে সন্ত্রাসীরা নিহত হয় তখনো ওই সব পণ্ডিত ব্যক্তিরা অকুতোভয় র‍্যাব বাহিনীর নয়, সমাজের দুষ্ট ক্ষত সন্ত্রাসীদের মানবত অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হন। সন্ত্রাসে জর্জরিত জনগণের স্বার্থে নয় - হাজার হাজার খুন, ধর্ষণ, হত্যা মামলার আসামি সন্ত্রাসীদের স্বার্থে ওই সব ব্যক্তিত্বরা কলাম লিখছেন পত্রিকার পাতা ভরে। তাদের চোখে সন্ত্রাসীরা দানব নয়। দানব তাহলে কারা অন্তত তাদের চোখে? অথচ দানব সদৃশ্য ওই সব সন্ত্রাসীরা র‍্যাব বাহিনীর সঙ্গ ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র জনগণ উল্লাস করে মিছিল বের করে। মিষ্টি বিতরণ করে সন্ত্রাসীদের প্রতি তাদের মনোভাবের প্রকাশ ঘটনায়। অন্যদিকে র‍্যাবের প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ। যা র‍্যাব বাহিনীর জন্য সামান্য প্রতিদান। বরং জনগণকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্ত করতে গিয়ে একজন র‍্যাব সদস্য আহত হলে তার আরোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া উচিত এবং যে কোনো র‍্যাব সদস্য নিহত হলে শোক প্রকাশ করা উচিত। এটা হয়তো আমার ব্যক্তিগত আবেগের চরম বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু যারা র‍্যাব বাহিনীর বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে সন্ত্রাসীদের সমর্থন করে বসছেন এবং একই সঙ্গে র‍্যাব ও জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদেরকে জনগণের সামনে নির্লজ্জভাবে উপস্থাপন করছেন তাদেরকে জনগণ কি বলবে? আর কোন চোখেই বা দেখবে?

নিরপেক্ষতার সবকদাতা গ্রহণযোগ্য নয়

তবে এরাই যদি মানবতাবাদী হন তাহলে নিশ্চয় মানবতার সংজ্ঞা নতুন করে লিখতে হবে। আসলে এরা মানবতাবাদীও নয়, জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষীও নয়। এরা কুচক্রী, স্বার্থান্বেষী। জনগণের মঙ্গলে এদের গাত্রদাহ

হয় আর জনগণের যে কোনো অমঙ্গলে (খরা, বন্যা, মঙ্গায়) এরা গোপনে আনন্দ-উল্লাস করে অর্থাৎ এক কথায় জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তাই যখন হাজারীদের মতো সন্ত্রাসী ও গডফাদারদের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয় তখন এরা হাজারীদের চোখে দেখেন না। কারণ হলো হাজারীদের একটি রাজনৈতিক পরিচয় আছে। মজার কথা হলো, এরা হাজারীদের আড়াল করতে গিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয়টাই উন্মোচন করে ফেলেন যা তারা খেয়ালও করেন না। তাই তারা নিরপেক্ষ সবকদাতা সাজতে গিয়ে জনগণের কাছ থেকে দূরে সরে যান। তাদের গ্রহণযোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেন।

অথচ সন্ত্রাস দমন এবং সন্ত্রাসীদের নিধনই জনগণের কাম্য। সন্ত্রাসীরা বিএনপি করে, না আওয়ামী লীগ করে তা জনগণের ধর্তব্যের মধ্যে নেই। জনগণের সেই ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে র‍্যাব বাহিনী দলমতের বাছবিচার না করে কেবল সন্ত্রাসী নিধন করলে জনগণ র‍্যাবের সমর্থন না করে র‍্যাবের বিরোধিতা কেন করবে? তাই জনগণ র‍্যাব ও সরকারকে এই কাজে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন যোগাচ্ছে। ফলে দলমত বিচার না করে যারা সন্ত্রাসীদের দমন করার চেষ্টায়রত তাদেরকে বিতর্কিত করতে গেলেই কি জনগণ তাতে বিভ্রান্ত হবে? তাদেরকে বিভ্রান্ত করা কি এতোই সহজ?

বড়শিতে মাছ গেথে

আসলে তারা বড়শিতে মাছ গেথে মাছকে নিয়ে খেলার মতো জনগণের সমস্যা নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলতে বড্ড বেশি ভালোবাসেন। তাই জনগণের কোনো সমস্যার সমাধান করার দিকে তাদের কোনো আগ্রহই লক্ষ্য করা যায় না। সন্ত্রাসে সন্ত্রাসে জর্জরিত জনগণকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে তার কোনো সমাধান তারা না দিলেও সন্ত্রাসীদের মানবতার নামে সন্ত্রাসীদের রক্ষা করে কিভাবে জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে রাখা সম্ভব হয় তাদের লক্ষ্য সেদিকে। বন্যার কারণে বেগুনের কেজি ৮০ টাকায় উন্নীত হলে তারা জনগণের চিন্তায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন, অথচ সেই বেগুনের দর (অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) ১২ টাকায় নেমে এলে জনগণ কতোটা স্বস্তি বোধ করছে তার খোজ রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন না। এই এরা সারা বছর সাম্প্রদায়িকতা বলে চিৎকার করে নিজেদের মাথা গরম করে ফেলেন। কিন্তু রোজা ও পূজা একই সঙ্গে শান্তি পূর্ণভাবে উৎযাপিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার অনন্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করলেও সেই প্রশংসাটুকু করার মতো উদারতা তারা দেখাতে পারেন না। কিসে যেন তাদের বাধা দেয়।

এদের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা থাকার কারণে তারা (জনগণ) আগাম বলে দিতে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের বদনাম থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার মানসে নেয়া সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে এরা বাধা দেবে। অথচ জনগণ মনে-প্রাণে কামনা করে দেশ সম্পূর্ণ র‍্যাপ দুর্নীতিমুক্ত হোক।

তাই বলা যায়, জনগণের চাওয়ার সঙ্গে, জনগণের ভাবনার সঙ্গে ওই সব স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা যে দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছেন তার কারণেই জনগণের সঙ্গে বা তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তারা কখনোই একাত্ম হতে পারেন না। পারেন না জনগণ সমস্যায় পড়লে তার ন্যায়সঙ্গত সমাধান দিতে। যদি জনগণের সঙ্গে তারা একাত্মতা অনুভব করতেন তবে তারা দেখতে পেতেন জনগণের মঙ্গলকামী হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তাদের স্থান। তবে অবশ্যই জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান নিতে গেলে জনগণের ভাবনাকে তাদের ধারণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাদের নিজস্ব ভাবনা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিলে হবে না। এক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থের ক্ষতিকর কোনো কাজ করলে সরকারের কঠোর সমালোচনা যেমন তারা করবেন তেমনিভাবে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে নেয়া যে কোনো মঙ্গলজনক কাজের প্রশংসা তাদেরকে করতেই হবে। এতে তাদের, জনগণের এবং এ দেশের সবার মঙ্গল নিহিত।

সরকার ও জনগণ এক মোহনায়

তবে আশার কথা, বর্তমান জোট সরকার বোধহয় জনগণের ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করার সুফল সম্বন্ধে জেনে গেছে। তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা ও গাফিলতি থাকলেও সরকার যে জনগণের মঙ্গল ছাড়া

অমঙ্গলজনক কোনো কাজ করবে না, জনগণের ভেতরে এই আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। জনগণও সন্ত্রাস দমনের জন্য সরকারের গঠিত র‌্যাব বাহিনী ও তার কার্যক্রমে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছে এবং সরকার ও জনগণ এর মাধ্যমে এক মোহনায় এসে মিলে গেছে।

জনগণের কামনা সকল ক্ষেত্রে যেন এই ধারা অব্যাহত থাকে।

আফরীন
মিরপুর, ঢাকা।

ধরা সম্ভব শুধু পাটি মুড়ানো অবস্থায়

আমাকে যেদিন ধরবি, সেদিন পাটি মুড়ানো অবস্থায় ধরতে পারবি। এক সন্ত্রাসীর এই উক্তিতে বোঝা যায় তারা মরতে প্রস্তুত। কিন্তু ধরা দিতে প্রস্তুত নয়। আমাদের দেশে মৃতুদেহ পাটি মুড়িয়ে বহন করা হয় এটা সবাই জানেন।

সম্পর্কে এক মামা, নিজের প্রভাব বিস্তার করার জন্য সন্ত্রাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এমন এক পর্যায়ে গেল যে তার মেয়েকে নেতার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হলেন।

ফলে অনেকে মামাকে সমীহ করে চলতো। নির্যাতনের একটা সময়সীমা থাকে। সম্ভবত তা অতিক্রম হওয়ার ফলে সন্ত্রাসী জামাইকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়ার চিন্তা মামা করেন।

একদিন জামাইকে নিমন্ত্রণ দিয়ে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ রাতে এসে ঘরে আশ্রয় নেয়। জামাই কম চালাক নয়।

আমাদের কুষ্টিয়ায় গ্রামের মানুষ ভ্যানগাড়িতে চলাচল করে। মেয়েরা কোথাও গেলে কাপড় দিয়ে ভ্যানগাড়ি ঘিরে যাতায়াত করে। সন্ত্রাসী জামাই এমন সাজানো একটি ভ্যানে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। চারদিকে নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে, কোথাও জনমানব নেই। উঠানে পা দিয়ে মনের মধ্যে একটু দুর্বলতা অনুভব করে দাড়িয়ে আছেন।

শ্বশুর তখন রান্নাঘর থেকে বললেন, ঘরের ভেতর যাও।

অন্ধকারে ঘরের মধ্যে এক পা দিতেই একটা পুরুষের হাত এসে তার জামা ধরে ফললো।

এতো পুলিশ! নিজে বাচার জন্য যতো শক্তি ছিল তা দিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে সে। তার জামা ছিড়ে যায়। সে নিজেকে মুক্ত করে বলে, আমাকে যেদিন ধরবি, সেদিন পাটি মুড়ানো অবস্থায় ধরতে পারবি। এই বলে সে অন্ধকারে মিশে যায়। পুলিশ তাড়া করে ধরতে পারলো না।

জীবনবাজি রেখে যারা সন্ত্রাসী ধরতে যায় তাদের যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে। সন্ত্রাসীরা মনে করে ধরা পড়লে আমরা তো মরবই, কাজেই যুদ্ধ করে মরি।

আর এ জন্যই হচ্ছে ক্রসফায়ারে মৃত্যু।

মোহাম্মদ আনছার উদ্দীন
গালিমপুর, নবাবগঞ্জ
ঢাকা।

মানব অধিকারে সোচ্চার এবং ব্যাঙের ঘুম

গত ৯ নভেম্বর ২০০৪-এ যায়যায়দিন পত্রিকার স্বদেশ কলামে ড. মুহাম্মদ ইয়াহহিয়া আখতার *ক্রসফায়ার এবং মানব অধিকার* শিরোনামে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনায় সুন্দরভাবে বেরিয়ে এসেছে তথাকথিত মানব অধিকার প্রতিষ্ঠান ও অতি দরদি মানব অধিকার কর্মীদের চরিত্র।

অর্থাৎ ড. ইয়াহহিয়ার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছি, এ দেশে যখন রাহেলারা তিন দিন জঙ্গলে পড়ে থেকে বাচার আকুতি জানায় এবং অতঃপর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে মৃত্যুবরণ করে, ফাহিম, সীমা অন্যান্য নাম জানা অজানা কিশোরীরা যখন বখাটে, মাস্তান নামধারী সোনার ছেলেদের দ্বারা উত্যক্ত কিংবা

বাহাদুরি ধর্ষণের পর আত্মহননের পথ বেছে নেয়, বিভিন্ন জেলা থেকে ফুসলিয়ে কিশোর বা বাচ্চাদের দুবলার চর বা অন্য কোনো দ্বীপে এনে তাদর শুটকি মাছ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অমানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে, এমনকি ওই দামড়া পুরুষেরা যখন ওই কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ওপর যৌন নিপীড়ন এবং নির্যাতন চালায়, মৌলবাদীরা যখন মুক্ত চিন্তার কোনো লেখক, সাংবাদিক ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষককে চাপাতি, রামদা দিয়ে কুপিয়ে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করে, আহাদদের মতো সৎ পুলিশ কর্মকর্তাকে যখন সন্ত্রাসীরা হত্যা করে, তথাকথিত গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে অপরাধীকে পুরস্কৃত করে, আক্রান্তদের উল্টো বেত্রাঘাত এবং সমাজচ্যুত করে চরম নিগৃহীত করে, আরো অনেক অন্যায়-অবিচার, হত্যাযজ্ঞ, আগুনে পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনা ঘটে তখন এই তথাকথিত মানব অধিকার কর্মী, প্রতিষ্ঠানগুলো চোখ কান বন্ধ রেখে, মুখে কুলুপ এটে দিব্যি হাইবারনেশনে (শীতকালে ব্যাঙের দীর্ঘ সময়ের ঘুম) চলে যায়। এই সমস্ত মানব অধিকার কর্মীরা আসলে এক একটি রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র ছাড়া কিছুই নয়। এরা সত্যিকার মানব অধিকার লঙ্ঘনের সময় চুপ থাকে এবং রাজনৈতিক দলের স্বার্থহানি বা রক্ষার্থে ভালো কাজের সময় সোচ্চার হয়।

জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ক্লিন হার্ট, র‍্যাব, কোবরা, গোখরা, চিতা, ভাল্লুক, হায়েনা ইত্যাদি দিয়ে ওই সমস্ত মানব অধিকার কর্মী বা প্রতিষ্ঠানকে যদি ক্রসফায়ার দিয়ে ভ্যানিশ করা যেতো তাহলে এদের এই মায়াকান্না থেকে জাতি রেহাই পেতো।

ফরিদুর রহমান চৌধুরী
সোনাডাঙ্গা, খুলনা।

ক্রসফায়ার সোজা ফায়ার

৯ নভেম্বর ২০০৪ প্রকাশিত ক্রসফায়ার এবং মানব অধিকার ড. ইয়াহিয়া আখতার-এর লেখাটি পড়ার পর আমি শুধু কয়েকটি কথা যোগ করতে চাই।

এক. মানব অধিকার পেতে হলে মানব অধিকারে বিশ্বাসী হতে হবে। যেমন বেহেশত পেতে হলে বেহেশতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়া অত্যাবশ্যক। ভয়ংকর খুনী যারা অবলীলাক্রমে একের পর এক খুন করে চলে, মানব অধিকার আছে বলে মানে না। তাই সে তা পেতেও পারে না।

দুই. মানব অধিকার আর নিরাপত্তা যখন মোকাবেলা করে তখন যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হয়। কিছু কিছু লোক আছে খুন-খারাবি বাড়লে বলে *স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই।* আবার হার্ট পরিষ্কার শুরু হলে তখন *গেল গেল* বলে চিৎকার শুরু করে।

তিন. ক্রসফায়ারেই হোক কিংবা সোজা ফায়ারেই হোক সন্ত্রাসী মারা গেলে কেবল গডফাদারদেরই কষ্ট। জনসাধারণ আনন্দিত। বম্বে পুলিশ অনেক বছর আগে এই চাদাবাজ সন্ত্রাসীদের ৬০০জনের মতো লোককে হত্যা করে সমস্যার সমাধান করেছে। আমাদেরও ধৈর্য ধরতে হবে। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ সন্ত্রাসমুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা দিতে পারবে।

সৈয়দ হান্নান
মহাখালী, ঢাকা।

হরতাল সফল করবে কারা?

১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর কম্বল চোর, রিলিফ চোর, চোরাকারবারী, ব্যাংক ডাকাত ও অবাঙালি মুসলমানদের ঘরবাড়ি এবং সম্পদ লুটেরা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কতিপয় দলীয় দৈনিক পত্রিকা সুপরিকল্পিতভাবে *র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন*-এর বিরুদ্ধে বিকৃত, বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

বাংলাদেশে ব্যাপক সন্ত্রাসের জননী, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং, তার পাচ বছর শাসন আমলে সন্ত্রাসীদের গডফাদার জয়নাল হাজারী, শামিম ওসমান, ডা. ইকবাল, হাজি সেলিম, হাজি মকবুল, আলহাজ কামাল মজুমদার, আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ, মহিবুর রহমান (বোমা মানিক), হাসনাত

আবদুল্লাহ প্রমুখ দেশে সন্ত্রাসকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। শীর্ষ আওয়ামী নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা সংসদে, সমাবেশে সন্ত্রাসীদের সমর্থন ও *বর্তমানের রবিন হুড* আখ্যায় টাইটেল দিয়েছিল।

আওয়ামী সন্ত্রাসীদের নির্যাতনে, অত্যাচারে জর্জরিত অতিষ্ঠ জাতি ১ অক্টোবর ২০০১-এর নির্বাচনে এদের কবর রচনা করে। নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত শেখ হাসিনা ও তার দেশের সন্ত্রাসীরা নতুন উদ্যমে আরো সহিংস মূর্তিতে দেশব্যাপী নৈরাজ্য এবং অরাজকতা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে ওঠে।

নিরুপায় জোট সরকার দলমত নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসীদের সমনের লক্ষ্যে *অপারেশন ক্লিন হার্ট*-এর মতো যৌথ অভিযানে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে *র‌্যাব, কোবরা, চিতা* সন্ত্রাস দমনে নিয়োজিত করা হয়।

আওয়ামী কম্বল চোরদের আতংক, সন্ত্রাসীদের যমদূত র‌্যাব, কোবরা, চিতার সাড়াশি অভিযানে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মৃত্যুতে এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, আনন্দ-উল্লাসে মিছিল করে, মিষ্টি বিতরণ করে। লাশে লাথি মেরে থুথু দিয়ে, জুতাপেটা করে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ মেটায়। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলীয় পোষা সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী বিকৃত এবং বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করে র‌্যাব, কোবরা, চিতাদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে সদাসচেষ্ট।

বাংলাদেশ থেকে আওয়ামী দলীয় ও ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী, খুনি, ধর্ষক, ছিনতাইকারী, ক্যাডার বাহিনী, র‌্যাব-কোবরা কর্তৃক নির্মূল হলে শেখ হাসিনার হরতাল সফল করবে কারা? হরতালের নামে গাড়ি ভাংচুর, ককটেল-বোমা মেরে, অফিসগামীদের দিগম্বর করে অফিস-আদালত অচল করবে কারা? যাত্রীবাহী দোতলা বাসে অগ্নিসংযোগে নিরীহ যাত্রীদের নৃশংসভাবে আগুনে পুড়ে ত্রাস সৃষ্টি করে হরতাল সফল করবে কারা? *সুন্দরবন এক্সপ্রেস*-এ অগ্নিসংযোগে নিরীহ যাত্রী ও গার্ড হত্যা করবে কারা?

শেখ হাসিনার দলীয় খ্যাত অথবা কুখ্যাত বুদ্ধিজীবী, পোষা সাংবাদিকদের অসততা, শঠতা, জালিয়াতি, আদর্শহীনতা, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এ দেশের আপামর জনসাধারণ সবিশেষ অবহিত। এদের অপপ্রচারে, বিকৃত খবরে জনগণ আর বিভ্রান্ত হয় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আওয়ামী লীগের হরতালের নামে সন্ত্রাসী ও ভাড়াটিয়া গুন্ডা দিয়ে দেশে নৈরাজ্য অরাজকতা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য শেখ হাসিনাকে বাংলার চিরস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত পূর্বক স্বাধীনতা উপহার দাতা ইনডিয়ার চিরস্থায়ী বাজারে বাংলাদেশকে পরিণত করা।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মানব অধিকার এবং মানব মাথা ব্যথা

বর্তমান জোট সরকারের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল সন্ত্রাস দমন। জনগণ সেই অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করেই ভোটের নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে জোটকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো পালন। জনগণ সেটা লক্ষ্য করে। প্রতিশ্রুতি পালনে ওই সরকার কতোটুকু সমর্থ হয়েছে বা কমপক্ষে কতোটুকু আন্তরিকতা দেখিয়েছে তার প্রভাব পড়ে পরবর্তী নির্বাচনে জনমতের মাধ্যমে।

গত সরকারের আমলে সন্ত্রাস, বিশেষ করে দলীয় সন্ত্রাস অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যদিও জনগণ সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী লীগকে ব্যর্থ মনে করে তাদের হটিয়ে জোটকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কিন্তু যে বিষবৃক্ষ একবার মাথা তুলে দাড়িয়েছে তাকে সেকেলে অস্ত্র সজ্জিত সেকেলে পুলিশ বাহিনী দিয়ে দমন এক কথায় প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। এই অবস্থায় সরকারের বয়স যখন প্রায় এক বছর তখন বাধ্য হয়ে সরকার সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীসহ যৌথবাহিনী নামায়। যৌথবাহিনী নামাতে যেন ভোজবাজির মতো সন্ত্রাসীরা উধাও হয়ে যায়। তারা মারাও পড়তে থাকে অনেকে। জনগণ খুশিই হয়েছিল। সন্ত্রাস অন্তত তিন ভাগের দুই ভাগ কমে গিয়েছিল।

প্রধান উপদ্রব

তবে আমাদের মতো গরিব দেশের অন্যতম প্রধান উপদ্রব যে, আমাদের মধ্যে অনেক উপদেশ দাতা, অনেক অভিভাবক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা সন্ত্রাসীদের মানব অধিকার বিষয়ক ব্যাপার নিয়ে অধিক মাত্রায় চিন্তিত থাকেন। তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধি, তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, কমা বিহীন বিশাল জটিল বাক্যবানে তারা সন্ত্রাসীদের মানব অধিকার হরণকারীদের কচুকাটা করেন। পত্রিকায় পাতার পর পাতা লিখে যান, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে মিনারাল ওয়াটারের বোতল সামনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুচিন্তিত মতামত দেন। যৌথবাহিনীর সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য এই সমস্ত আতেল বুদ্ধিজীবীরা মহা হই চই ফেলে দেন। সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগও অত্যন্ত জোর গলায় বলতে থাকে যে, যৌথবাহিনী দিয়ে তাদের নেতাকর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। ফলে সরকার বাধ্য হয় যৌথ অভিযান বন্ধ করতে। আবার তথৈবচ। সন্ত্রাসীরা যেন হাপ ছেড়ে বাচলো। আবার নাভিশ্বাস উঠলো জনগণের এবং মানব অধিকার কর্মীবৃন্দ ও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস বিষয়ে একদম চুপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এরা যৌথবাহিনীর কর্মকাণ্ডে যতোটুকু চিৎকার-চেচামেচি করেছে তার হাজার ভাগের এক ভাগ যদি সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে করতো তাহলে অচিরেই সন্ত্রাস নির্মূল হয়ে যেতো।

আবারও সেই একই কাহিনী

র‌্যাব বাহিনীর বর্তমান কর্মকাণ্ডে জনগণ অভিভূত, চমৎকৃত ও উচ্ছ্বসিত। এদের হাতে মারা পড়ছে সন্ত্রাসীরা। সে যেভাবেই হোক। কিন্তু আবারও সেই একই কাহিনী। সন্ত্রাসীদের মানব অধিকার রক্ষা, আইনের শাসন, আইন অনুযায়ী বিচার। একটা জিনিস বোঝা উচিত যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্যই আইন। যে কোনো সন্ত্রাসীকে জনগণের মাঝে ছেড়ে দিয়ে দেখুন, জনগণ তাদের ছিড়ে খাবে। সুতরাং সন্ত্রাসী মরলে ক্ষতিটা কোথায়? জনমতের প্রতিফলনই আইনের শাসন।

জনগণের প্রতি আওয়ামী চ্যালেঞ্জ

আওয়ামী লীগ, তার অঙ্গসংগঠন, আওয়ামী বুদ্ধিজীবী, আওয়ামী আইনজীবী সব মহল দাবি করছে যে, সরকার র‌্যাব নামের কিলিং মেশিন সৃষ্টি করেছে এবং এদের দ্বারা ক্রসফায়ারের মাধ্যমে আওয়ামী নেতাকর্মীদের হত্যা করছে। আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য এটা সরকারের গভীর ষড়যন্ত্র।

এটা অত্যন্ত চিন্তার কথা। র‌্যাবের হাতে যারা মারা পড়ছে তারা যদি আওয়ামী নেতাকর্মী হয় তাহলে জনগণ চাইতে বাধ্য হবে যে, আওয়ামী লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। আমরা চাই না এমন একটি দল জীবন্ত থাকুক যে দলের নেতা কিংবা কর্মী পিচ্চি হান্নান, মহিম, সুইট, কালা জাহাঙ্গীর, লাল্টু যারা সকলের কাছে শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত। প্রশ্ন জাগে, এ জন্যই কি আওয়ামী লীগ আমলে সন্ত্রাস এতোটা বেড়ে গিয়েছিল? এটা প্রকৃতপক্ষে জনগণের দাবির প্রতি চ্যালেঞ্জ। যে সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডে জনগণ অতিষ্ঠ সেই সন্ত্রাসীদের দমনে বাধা সৃষ্টি জনগণ কখনোই মেনে নেবে না। জনগণের অধিকার, মানব অধিকার যখন সন্ত্রাসীরা কেড়ে নেয় তখন তার পাশে কেউ থাকে না। যদিও কোনো কোনো সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আর্থিক ও আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে। সেটা সামষ্টিক সন্ত্রাসকে কমাতে মোটেই সাহায্য করে না। সেটা সন্ত্রাসের ক্ষতিপূরণ মাত্র। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এটা কোনো প্রতিকার নয়। এ জন্য চাই সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ। সেটা করতে পারে কেবল একটি গণতান্ত্রিক সরকার এবং তার দৃঢ় মনোবল। যেটা সরকার র‌্যাব নামের আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীর মাধ্যমে করেছে।

সন্ত্রাস ঘটে যাবার পর তার শাস্তি বিধান বা ক্ষতিপূরণ নয়, আমরা চাই সন্ত্রাসের মূল উৎপাদন তথা প্রিভেনটিভ একশন। শরীরে ফোড়া উঠলে যেমন কেটে ফেলতে হয়, তাতে একটু ব্যথা পেলেও সেটা যেমন ধর্তব্য নয় তেমনি সন্ত্রাসীদের মানব অধিকার নিয়ে এতো মাথা ব্যথার কিছু নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যখন সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও চরম ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং তাতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক হয়রানিরও স্বীকার হচ্ছে। তারপরও তারা তা মেনে নিচ্ছে। সেখানে আমাদের দেশে সন্ত্রাসের মতো একটি জাতীয় সমস্যা

মোকাবেলায় সন্ত্রাসীদের মানব অধিকার বিষয়ে ভাবার সময় কোথায়? সরকারের প্রধান দায়িত্ব জনগণের অধিকার রক্ষা করা, সন্ত্রাসীদের মানব অধিকার রক্ষা করা নয়। সেটা যাদের দায়িত্ব তারা চেচামেচি করুক।

এডভোকেট **এম.এ মুরতজা**

র‍্যাব ভীতি ও তৃপ্তি

র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর জন্ম ২১ মার্চ ২০০৪-এ। যাত্রা শুরু ২৬ জুন ২০০৪-এ।

প্রচণ্ড দাপটে ধাবমান সন্ত্রাস নামের পাগলা ঘোড়াকে বাগে আনতে শতকরা ৪৪ ভাগ সেনাবাহিনী, শতকরা ৪৪ ভাগ পুলিশ, শতকরা ছয় ভাগ বিডিআর, শতকরা চার ভাগ আনসার, শতকরা এক ভাগ কোস্ট গার্ড এবং শতকরা এক ভাগ অন্যদের নিয়ে গঠিত এলিট ফোর্স তার কাজ করে যাচ্ছে। র‍্যাবের অপারেশনের ফলে আজ সর্বস্তরের সন্ত্রাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত। তারা সকলেই ক্রসফায়ারের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে দেশের আপামর জনসাধারণ আজ চরম তৃপ্তির সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলছে। চলছে, ফিরছে, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করছে। শান্তির সুশীতল বায়ু ঝিরিঝিরি বয়ে যাচ্ছে মানুষের অন্তরে।

লক্ষণীয়, ২০০২ সালে সন্ত্রাস নির্মূলে সেনা, নৌ, বিডিআর ও পুলিশের সমন্বয়ে পরিচালিত *অপারেশন ক্লিন হার্ট* সফল হলেও বেশ কিছু নিরীহ মানুষও হয়রানির শিকার হয়। কিন্তু র‍্যাবের কাজে দেশবাসী অবাক। সাধারণ মানুষ এখন পর্যন্ত হয়রানির শিকার হয়নি। সন্ত্রাসীরাই কেবল র‍্যাবের শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই তো সারা দেশে র‍্যাবের জয়জয়কার পড়ে গেছে। অবশ্য সমালোচনাও হচ্ছে। কিছু মানব অধিকার (!) সংস্থা, এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সংবাদকর্মী, আইনবিদ, পলিটিশিয়ান র‍্যাবের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে র‍্যাবের সফল অভিযান তারা কিছুতেই বরদাশত করতে পারছে না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, সন্ত্রাসীকে মেরে র‍্যাব মহা অন্যায় করে ফেলছে। মানব অধিকার লঙ্ঘন করছে।

অথচ যখন একের পর এক সাধারণ মানুষ খুন হয়েছে, নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছে সন্ত্রাসীদের হাতে তখন এরা মুখে কুলুপ এটে থেকেছে। এদের কলম তখন ভোতা ছিল, চোখ ছিল অন্ধ, কান ছিল বন্ধ। আসলে এরা তো সন্ত্রাসীদের উচ্ছিষ্ট ভোগী। প্রকারান্তরে এরাই সন্ত্রাসীদের গডফাদার। এদেরকেও ধরা দরকার। সন্ত্রাসের পক্ষ নেয়া এসব কলমবাজ, কণ্ঠবাজ সন্ত্রাসীদেরও শাস্তি হওয়া দরকার। আমরা এ দেশের আপামর জনতা চাই সন্ত্রাসমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। র‍্যাবের কার্যক্রম সেই চাওয়াকে সফল করবে, এটাই প্রত্যাশা।

ইলিয়াস শরীফ
আগপুংলী, পাবনা।

নিরাপত্তা মানেই র‍্যাব

আমাদের সময়ের বাবারা-মায়েরা যদি সাহসী হতেন অথবা উদারপন্থী মনের মানুষ হতেন তাহলে হয়তো আজ আমরা অনেক এগিয়ে থাকতাম। আমার দুঃখ-আফসোস, আমাদের সময় দেশে মহিলারা সেনা বিভাগে যেতে পারতো না। আমার কি যে ভালো লাগে আর্মিদের ডিসিপ্লিন লাইফ!

আজ বড় দুঃখ লাগে, জীবনে দেশের জন্য কিছু করতে পারলাম না। একটাই জীবন কতো অনাদরে, অবহেলায় রান্না-বান্না করে ঘরের নিভৃত কোণে নষ্ট করে ফেললাম। যেই বয়স সেই যৌবন কি আর ফিরে পাবো যখন দেশের জন্য জনগণের জন্য কিছু করার কথা!

কবি নজরুল যৌবনে *রাজটিকা* দিতে বলেছিলেন। অথচ তিনি যদি মহিলাদের নিয়ে কিছু করার কথা বলতেন, আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারতাম। সংসার পালন, ছেলেমেয়ে মানুষ করা, স্বামীকে ভালোবাসার বাইরেও নিজের জন্য প্রত্যেকটা নারীর কিছু সময় রাখা উচিত যাতে করে সে কিছু একটা করতে পারে, যাতে মরে গেলে মানুষ তার কর্ম সাফল্যের কথা মনে করতে পারে। স্বামী, পিতা বা সন্তানের নামে যেন তাকে দাফন করা না হয়।

আমি যদি একবার র‌্যাবের সদস্য হতে পারতাম, জীবন দিয়ে হলেও সন্ত্রাস নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করতাম। আমার তো আর সেই বয়স নেই। র‌্যাবের সদস্য দেখলে উত্তেজনায় শরীরের রক্তে কাপন অনুভব করি। আমি চাই আমার দুটো মেয়েকে আর্মিতে (লং কোর্সে) দিতে। জানি না আমার মনের এই বিশাল সুপ্ত আশা আল্লাহ পূরণ করবে কি না। পাঠকবৃন্দ, আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমার মেয়েরা দেশের জন্য কিছু করতে পারে।

র‌্যাব থাকুক অনেক অনেক বছর। তাদের দেখে দেশের সন্ত্রাসীরা ভালো হয়ে যাক। মেয়েরা সাহসী হোক প্রতিপদে, প্রতিক্ষণে প্রতিটি ক্ষেত্রে। ধন্যবাদ।

রোজী
কাউনিয়া, বরিশালফ